অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত গমন - পলায়ন না নির্বাসন?

- গৌতম কুমার দাস

মগধের চম্পাবতীর গঙ্গার পার থেকে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই সোনালী ফসল। গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা বাতাসে মাঠে মাঠে দোলে কার্তিকের ধান। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলা মহাবিহারের আবাসন থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে গঙ্গা পারে বিকেল বেলায় একাকী এসে দাঁড়িয়েছেন। শ্মশ্রু-মস্তক মুন্ডনে তাঁর বয়স ঠাওর হয় না। সারা শরীর জুড়ে গৌরবর্ণের ওপর গঙ্গায় ডুবতে যাওয়া সূর্যের শেষ গোধূলীর আভায় তাঁকে রক্তিম লাগছে। বাঁ দিকের কাশবন ছাড়িয়ে তিনি সূর্যাস্ত দেখছেন। আগামীদিন থেকে তাঁর এই মাঝে মধ্যে এসে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা আর হবে না। কালই তিনি তিব্বতে যাত্রা করছেন। মহামান্য পাল রাজার নির্দেশে তাঁর অতি প্রিয় ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যাপনার কাজে ইতি টেনে তিনি যাবেন সুদূর তিব্বতে। তিব্বতের রাজা বৌদ্ধ ধর্মের এক সুপন্ডিত চেয়ে পাঠিয়েছেন পালরাজা নয়পালের কাছে। রাজা নয়পালের কাছে প্রস্তাব আসা মাত্রই তিনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম পছন্দ করে তাঁর তিব্বতে যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশ ও অর্থ বরাদ্দ করেছেন। তিব্বতরাজের অনুরোধে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও পাঠদানের জন্য রাজা নয়পালের দ্বিতীয় কোন নাম মনেই আসে নি। অন্য কোন নাম বিবেচিত হওয়ার কথাও নয়। পাল যুগের অন্যতম পরাক্রান্ত রাজা মহীপালের ৫৪ বছরের রাজত্বের শেষ দিকে বিক্রমশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম শেষ করেও কোন দিন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজ-সন্দর্শণে রাজসভায় উপস্থিত হন নি। মহীপালের রাজত্বের পর তাঁর পুত্র নয়পালের ষোল বছরের রাজত্বকালের (১০৩৮-১০৫৪ খ্রিঃ) শুরুতেও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজসভায় একদিনের জন্যও উপস্থিত হয়ে রাজ-বন্দনা করেন নি। অতএব রাজরোষ। তার ফলেই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বতে গমন। প্রকারান্তরে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনে নেমে আসে নির্বাসন।

গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের স্মৃতির সরণি দিয়ে কত কথাই না গঙ্গাজলের মতো বয়ে যায়। থেকে থেকে তাঁর বালকবেলা মনে পড়ে। আচার্য জেতারির গুরুগৃহে পড়তে যাওয়ার সময় তাল-নারকেল-সুপারির পাতায় নৌকা বানিয়ে শ্রীমতী নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মধুর স্মৃতি। তালপাতা তার ঝোলায় সবসময়ই থাকত। গুরুর আদেশে তালপাতায় লেখা শিখতে হতো। বড়ো হতে না হতেই গুরুদেব জেতারির উপদেশ মতো বিদুষী পদ্মপ্রভা ও পন্ডিতপ্রবর কল্যানশ্রী-এর কাছে শ্রীজ্ঞানকে যেতে হতো। আচার্য জেতারি, পদ্মপ্রভা ও কল্যানশ্রী সকলেই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের

সুরোহর গাঁয়েরই অধিবাসী। তাই বালক অতীশের গুরুগৃহে যাতায়াতে কোন কষ্টবোধ হতো না। মাঝেমধ্যেই লেখাপড়ার অবকাশের দিনগুলিতে সুরোহর ছাড়িয়ে পাশের গ্রাম ভদ্রশিলায় চলে আসে সে। ভদ্রশিলা গাঁ সুরোহরের মতো শ্রীমতী নদীর তীরেই। ভদ্রশিলায় শ্রীমতী নদীর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের জগদলা গাঁয়ের কাশবনে ঢাকা প্রকান্ড মাঠটিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখে। ওখানেই নাকি গড়ে উঠবে জগদ্দল মহাবিহার। কবে হবে, কে জানে!

ইটাহারের কাছে জগদলা গাঁয়ে জগদ্দল মহাবিহার স্থাপিত হয়েছিল। ধর্মাকর, দানশীল শুভাকর গুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র, মোক্ষাকর গুপ্ত প্রভৃতি আচার্যরা জগদ্দল মহাবিহারে পাঠদান করতেন। বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানায় জগদলা গাঁয়ে জগদ্দল মহাবিহারের ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। ভগ্নস্তূপের এপারে ভদ্রশিলায় জনৈক পালবাবুর চায়ের দোকানে চা-সিঙ্গাড়া খেতে খেতে বলেই ফেলি - আপনার পূর্বপুরুষ আবার রামপাল নয়তো! এক গামলা চিড়ে দুধ চিনির মন্ড দোকানদারি করা বউয়ের সামনে উদরস্থ করে খালি গায়ে ধুতিপরা পালবাবু ঢেঁকুর তুলে রাজকীয় ঢঙে বলেন - রামপাল, শূরপাল, মদন পাল আমার কাকা, জেঠা, দাদুদের নাম ছিল। ওরা পাল রাজাদের বংশধর কিনা তা অবশ্য জানি নে। তবে ক্লাস নাইন অবধি পড়া ইতিহাসের বিদ্যেয় মনে পড়ছে যে গোপাল ওদন্তপুরী মহাবিহার, ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহার, আর দেবপাল সোমপুর মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

দেবকোট মহাবিহার অতীশের সবচাইতে বেশী মনে পড়ে। তার কারণও আছে। দেবকোট মহাবিহারে শিক্ষার্থী থাকাকালীন অতীশ কৈশোর পেরিয়েছে। সবে যৌবন এসেছে। দেবকোট মহাবিহারের প্রকৃতিও ছিল অনন্য। সামনেই ধলদিঘি। ধলদিঘি পুনর্ভবা নদীর পরিত্যক্ত খাত। পালরাজারা এই দিঘিটির পুনর্ভবা নদীর সঙ্গে খাল কেটে সংযোগ ঘটিয়ে নৌ-সামরিক তথা নৌ-বহর রাখার কাজে লাগাতো। দেবকোট মহাবিহার থেকে ঘাটের সোপান যেখানে ধলদিঘির প্রায় তলদেশে নেমে এসেছে, ওখানেই একটা সুড়ঙ্গ। ওই সুড়ঙ্গ বানগড়ের সঙ্গে যুক্ত। বানরাজার আমলে বানরাজার দুই রাণী ধল রাণী ও কাল রাণী ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বানগড় থেকে ধলদিঘিতে স্নান করতে আসতেন। পাল রাজাদের আমলে ওই সুড়ঙ্গ সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়। অতীশ দীপঙ্করের ঘুরে বেড়ানোর কত জায়গা। পুনর্ভবা নদীর পাশেই মন্দির নগরী বানগড় যা অতীশের প্রতিদিনই নতুন লাগে। অতীশের ঘুরে বেড়ানোর অঢেল সময়ও নেই। পড়ার চাপ আছে। দেবকোটের জগদ্বিখ্যাত পন্ডিতকুল তার আচার্য। অতীশ আচার্য অদ্বয়ব্রজ, উধিলিপা, ভিক্ষুনী মেখলা প্রমুখ নামের সেকালে খ্যাতির শীর্ষে থাকা বিদ্বান বিদূষীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে চলে। অতীশের জ্ঞান অন্বেষণের খিদের বেশ কিছুটা এখানেই

মেটে। দেবকোট মহাবিহার থেকে শিক্ষান্তে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ শেষে ওখানেই কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। শেষে রাজা মহীপালের আদেশ শিরোধার্য করে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পালরাজা মহীপাল তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। যদিও ততদিনে অতীশ দীপঙ্কর ক্রমে শ্রীজ্ঞান হয়ে উঠেছেন যার রাজতন্ত্র একেবারেই না-পসন্দ। মহীপাল পরাক্রমী রাজা হয়েও সামাজিক কাজে ব্রতী। কিন্তু যা কিছু তাঁর কাজ সবেতেই রাজার নাম। দিনাজপুর জুড়ে মহীপাল, মহীপুর, মহীসন্তোষ, মহীপাল দিঘি তাঁর কীর্তিকে স্মরনীয় করলেও সর্বত্রই রাজার নামে নামকরণ রাজতন্ত্রেরই নমুনা।

শিক্ষাজীবনে দেবকোট মহাবিহার অতীশের সব চাইতে বেশী পছন্দের ছিল। পালযুগের বৃহদায়তন বৌদ্ধবিহার ১২০৫ খ্রিঃ-এ ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আদেশে অবয়বে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয়ে রূপান্তরিত হয়। ক্রমে বখতিয়ার ধলদিঘি ও কালদিঘির পাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করেন। পরে সুলতানি আমলে দেবকোট একটি শক্তিশালী দমদমা ও উন্নত কসবাহ্ ছিল। বর্তমানে দেবকোট মহাবিহার মৌলানা আতা শাহের দরগা। সুফীসাধক আতা শাহ সুপরিকল্পিতভাবে দেবকোট মহাবিহারটিকে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। পরে ইসলাম ধর্মে আপত্তিজনক হওয়া সত্ত্বেও এই রূপান্তরিত মসজিদের অন্দরেই আতা শাহের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাকে দাফন করা হয়। এককালের বৌদ্ধবিহারের ক্রমে মসজিদ ও দরগায় পরিবর্তিত হওয়ার এমনই ইতিবৃত্ত। অথচ এখনো আতা শাহের দরগা নামে পরিচিত প্রত্নস্থলে দিঘির চওড়া সিঁড়িগুলির পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাটের ধাপে ধাপে শঙ্খ, স্বস্তিকা চিহ্ন, পদ্মফুল, লতাপাতার নকশা ইত্যাদি দেখা যায়। একইরকম অলংকরণ আতা শাহের দরগার দেওয়াল জুড়ে লক্ষ্যনীয়। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো খ্যাতিমানদের জ্ঞান অর্জনের বৌদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে জমজমাট দেবকোট মহাবিহারের সব চিহ্ন মুছে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে ধুয়ে মুছে দিতে পারে না। কালের করাল গ্রাসে কোন কোন সংস্কৃতি লোপ পায় বটে, তবে তা সেই সংস্কৃতিরই দুর্বলতার নিজস্ব কারণে, অন্য সংস্কৃতিকে জোর করে হটিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই নয়। তবু ভালো যে বখতিয়ার খলজীর নির্দেশে দেবকোট মহাবিহারের পরিচয় বদলে গেলেও কাঠামোটা আজো দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই একই তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অতি প্রিয় ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহার ১২০৫-এ ধ্বংস করে দেন। ভাগ্যিস, এমন ঘটনার প্রায় একশ বছর পূর্বে অতীশ দীপঙ্করের মৃত্যু হয়েছে।

তখন দেবকোট মহাবিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন শেষে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পান্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। খ্যাতির ভাগ নিতে চায় সকলেই। দেশ-কাল সেখানে পিছিয়ে নেই। বিক্রমশীলা মহাবিহারে সুনাম ছড়িয়ে পড়ায় ঢাকার কাছে বিক্রমপুরের লোকেরা দাবি করে বসে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম নাকি ওখানেই। বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন - এমনটাই কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত। ঐতিহাসিকদের এমন দাবি বছর দুই আগে আরো জোরালো হয়েছে। মুন্সি গঞ্জের বিক্রমপুরে বারো-তেরশ বছর আগের একটি বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিকরা বলছেন যে প্রাচীনকালের পন্ডিত ও মহাচার্যদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর সর্বাধিক আলোকিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। জীবনের শেষ সময়টা তিব্বতে কাটাবার ফলে বাঙালির স্মৃতির আড়ালে তিনি চলে গিয়েছেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে চিঁই নামের এক চীনা গবেষক-অধ্যাপক অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নামে একটি মার্বেল ফলক স্থাপন করেছেন। বজ্রযোগিনী গ্রামকে স্থানীয়রা বলে পন্ডিতের ভিটা। পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থল হিসাবে চিহ্নিত স্থানে একটি সুদৃশ্য স্তম্ভ ও একটি ছোটখাটো বাড়ি তৈরী করে দিয়েছেন জনৈক মুসলমান যার নাম লতিফ শেখ। ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর সেতু পেরিয়ে বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থানের পত্তন করে কতিপয় ঐতিহাসিক শুধু ক্ষান্ত হন নি, ঠিকুজি খুঁজে তাঁর বাবা-মায়ের নামও প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাবার নাম কল্যানশ্রী ও মায়ের নাম প্রভাবতী, যদিও ইতিহাসের পাতায় কোথাও শ্রীজ্ঞানের পিতামাতার নাম পাওয়া যায়নি। তবে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার সুরোহর (বর্তমানে সুরুন) গ্রামে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বালকবেলায় জেতারি, কল্যানশ্রী, পদ্মপ্রভার কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। শ্রীজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষিকা যথাক্রমে কল্যানশ্রী ও পদ্মপ্রভার নাম বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গাঁয়ে যথাক্রমে তার পিতা কল্যানশ্রী ও মাতা প্রভাবতীর নামে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

তিব্বতের বৌদ্ধগুম্ফায় শান্তি আছে। সেখানে রাজরোষও নেই, অনুকম্পাও নেই। লেখাপড়া করার পরিবেশ আছে। এখানকার লামারাও বেশ শান্ত, সৌম্য। পৌঢ় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেবকোট মহাবিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত বিদ্যা থেকে বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দ বিদ্যা, সাংখ্য, চিকিৎসাবিদ্যা প্রাণভরে শেখাতে শুরু করলেন। শুধু জ্ঞানচর্চা বা অধ্যাপনা নয়, একই সাথে তিনি গ্রন্থরচনায় মনসংযোগ করতে শুরু করলেন। তিনি বজ্রযান সাধন বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী। তাঁর

অধিকাংশ বই তাই বজ্রযান সাধন বিষয় নিয়ে লিখিত। তাছাড়া অনুষঙ্গ বিষয়ও তিনি বাদ দেন নি। প্রায় ১৬৮টি বই তিনি তিব্বতে বসেই রচনা করেন। সেই সব বই তিব্বতী ভোটি ভাষায় লিখিত। তাঁকে নিয়েও বই লেখেন ওখানকার অন্য লামারা। ওই বইগুলিতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-এর নাম ব্যবহার না করে তাঁকে 'ধর্মনিধি' উপাধিতে অভিহিত করা হয়েছে। তিব্বতে এখনো অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনী ও কর্ম বিষয়ে আলোচনা চক্র চলে এমনটাই দাবি করলেন তিব্বতের অদূরে তাওয়াং গুম্ফার প্রধান ও প্রবীন লামা। তাঁর মতে অতীশ দীপঙ্করের মতো পন্ডিতদের দূরদর্শী অবদান সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক পর্যায় ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব বৌদ্ধধর্মের অবসানের কারণ। তিব্বতীয় লামা তারানাথ ও ভোটি ভাষায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তাঁর গুরু একই গ্রামের বাঙালী আচার্য জেতারির কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রাজনৈতিক টালবাহানা সত্ত্বেও তাওয়াং গুম্ফায় তিব্বত থেকে দলাই লামা প্রায়শই আসেন এবং তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রীয় আলোচনায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম উঠে আসে। আগামী বছরের মার্চ মাসে দলাই লামা ফের আসছেন তাওয়াং গুম্ফায়। কিন্তু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত থেকে কোনদিনও বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন নি। হয়তো ফিরে আসতে পারেন নি। অথবা তাঁর ফেরার ইচ্ছে হয় নি। রাজরোষে বিদ্দজ্জনদের এমন নির্বাসন মেনে নিতে হয়। বর্তমান ভাগলপুরে বিক্রমশীলা বিহারের ধ্বংসস্তূপের কাছের গঙ্গার একমুখী প্রবাহের মতোই সেই নির্বাসন একালেও চলে।